অরূপের রূপ ও ভাষা

মনসিজ মজুমদার

[FAR-এর সেমিনারে পঠিত রচনার পরিমার্জিত এবং পরিবর্ধিত রূপ এই প্রবন্ধটি। সেমিনারের বৌদ্ধিক নিয়ন্তা, উৎপলকুমার বসুর নির্দেশ ছিল কোনো রকম মূল্য বিচার না করে চিত্রকলায় বিমূর্তনার আলোচনা করতে হবে। ব্যক্তিগতভাবে এই লেখক যে বিমূর্ত চিত্রকলার গভীর অনুরাগী তা নয়। কিন্তু বিমূর্ত চিত্রকলাকে বাদ দিয়ে আধুনিক চিত্রকলায় কারোর আগ্রহও অনুসন্ধিৎসা সুদূরপ্রসারী হতে পারে না।

বলা বাহুল্য, এই প্রবন্ধে সন্নিবিষ্ট অনেক তথ্য এবং আলোচিত অনেক বিষয় বিভিন্ন বই ও রচনা থেকে আহৃত। সেগুলির উল্লেখপঞ্জী থাকলে প্রবন্ধটি সম্পূর্ণ হত। কিন্তু সব বই হাতের কাছে নেই, নাম ও প্রকাশ-তারিখ, লেখকের নামও যথাযথ মনে নেই। তাছাড়া প্রবন্ধটির আরও পরিমার্জনা ও পরিবর্তনের অবকাশ আছে। সেই চূড়ান্ত লেখাটি যদি কোথাও প্রকাশ করার সুযোগ পাই তবে অবশ্যই পাঠতালিকা সেখানে থাকবে।]

অরূপ বা বিমূর্ত যে-ভাবেই আমরা ইংরাজি abstract শব্দটির বাংলা করি না কেন তার মধ্যে একটা নঙর্থক ব্যঞ্জনা থাকেই। abstract-এ তা নেই। abstract কথাটি

সারাৎসার, সংক্ষিপ্ত ইত্যাদি সদর্থক অর্থেও ব্যবহার করা চলে। একটি সদর্থক শব্দ আমাদের ভাষায় কেন সৃষ্টি হয়নি— তা ভাববার ব্যাপার। কারণ রূপ ও অরূপের দ্বৈতশাসন আমাদের চেতনায় চিরকালই ছিল। রূপময় জগতের সঙ্গে নিত্য ও প্রত্যক্ষ সংযোগের পাশাপাশি এক অপ্রত্যক্ষ, অব্যয় অনির্বচনীয় কিছুর বোধ যে মানুষ অর্জন করেছিল— সে-বোধ অস্ফুট বা অস্পষ্ট হলেও— তার নিদর্শন প্রাচীন বা আদিম সংস্কৃতিতে সব দেশেই যেমন পাওয়া যাবে তেমনি আমাদের দেশেও মিলবে।

অরূপের চর্চা করেছেন আদিম মানুষ— প্রকৃতি ও মানুষ কোনো এক অদৃশ্য, সর্বশক্তিমান সত্তার হাতে নিয়ন্ত্রিত মনে করে। এঁদের মধ্যে অনেকে চিরকালের মিস্টিক ছিলেন। মিস্টিকের সাধনা রূপের মধ্যে অরূপের— অনিত্যের মধ্যে নিত্যের, যা কিছু মূর্ত তার মধ্যে বিমূর্তের সন্ধান করা। দার্শনিকের তত্ত্বজিজ্ঞাসা ও বিমূর্তের সাধনা— সত্য বা নিত্যের জ্ঞান নিরাকার, রূপহীন। শিল্পীরা— বিমূর্ত রীতির শিল্পীর কথা বলছি না— দৃশ্যজগতের পরিচিত অবয়ব বা দৃশ্যজগতের অনুকৃতিকে এমন এক রূপময়তায় প্রাণিত করেন যাতে অরূপের ব্যঞ্জনা থাকে। এই ব্যঞ্জনা না থাকলে তাঁর ছবি নিছক দৃশ্যজগতের নকল বলেই মনে হবে।

সকল শ্রেণীর অরূপ সন্ধানীর মধ্যেই অবশ্য শিল্পী থাকতে পারেন। শিল্পীও মিস্টিক, শিল্পীকে তাই ফরাসী ভাষায় বলা হয় mystique manqué অর্থাৎ তিনি লক্ষ্যচ্যুত মিস্টিক কারণ যা অনির্বচনীয় তাকে প্রকাশ করাই তাঁর লক্ষ্য। মিস্টিক দৃশ্যমান জগতেই অরূপকে প্রত্যক্ষ করেন, আর শিল্পী অরূপকে রূপের নিগূঢ় বাঁধার জন্যে দৃশ্যমান জগত থেকেই অবয়ব— প্রতিমা নির্বাচন করেন। তবু মিস্টিকের কাজ রসিকের, শিল্পীর কাজ স্রষ্টার। রবীন্দ্রনাথের চতুরঙ্গের শচীশের ভাষায় :

> তিনি রূপ ভালবাসেন, তাই কেবল রূপের দিকে নামিয়া আসিতেছেন, আমরা তো শুধু রূপ লইয়া বাঁচি না, আমাদের তাই অরূপের দিকে ছুটিতে হয়··· গান যে করে সে আনন্দ হইতে রাগিনীর দিকে যায়, গান যে শোনে সে রাগিনী হইতে আনন্দের দিকে যায়··· তিনি বাঁধিতে বাঁধিতে শোনান, আমরা খুলিতে খুলিতে শুনি।

ঈশ্বরের মতো শিল্পীর অভিযান অরূপ থেকে রূপে— শিল্প রসিকের যাত্রা সেই রূপ থেকে অরূপে। কিন্তু যে-শিল্পীরা অরূপের চর্চা করেন এবং তাকে রূপের বন্ধনে বাঁধতে চান এবং পরিচিত রূপময় জগতের অবয়ব, উপমা, চিত্রকল্প, প্রতীক ইত্যাদি সংগ্রহ করে অরূপকে রূপ দেন তাঁরা যে বিমূর্তরীতির শিল্পী তা নয়। তাঁরা অরূপ বা বিমূর্তকে প্রত্যক্ষ করেও রূপে ফিরে আসেন— এবং সে-রূপে থাকে পরিচিত রূপ ও অবয়বেরই অনুকৃতি। চতুরঙ্গ থেকেই একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে ব্যাপারটা বোঝানো যেতে পারে। শচীশের সন্ধানে দামিনী এক প্রখর অগ্নিবর্ষী দুপুরে নদীর ওপারে জনপ্রাণীহীন বালির চরে পৌঁছল। এক সীমানাহীন ফ্যাকাশে সাদা সেই বালির চর, তার মাঝখানে 'দামিনীর বুক দমিয়া গেল।' সেই চরের যে ছবি রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন তা এক বিমূর্ত ছবি :

এখানে যেন সব মুছিয়া গিয়া একেবারে গোড়ার সেই শুকনো সাদায় গিয়া পৌঁছিয়াছে। পায়ের তলায় কেবল পড়িয়া আছে একটা 'না'। তাতে না আছে শব্দ, না আছে গতি, তাহাতে না আছে রঙের লাল, না আছে আকাশের নীল, না আছে মাটির গেরুয়া।

এই abstract আমাদের নঙর্থক অরূপ, অর্থাৎ তার যে রূপ, তাকে নির্দিষ্ট করতে হয় কী আছে তা দিয়ে নয়, কী নেই তা দিয়ে। যেমন অরূপ ব্রহ্মকে negative দিয়ে বোঝাতে, হয়, তিনি কী তা বলা যায় না, তিনি কী নয় তা বলা যায়। কিন্তু এই শিল্পী যে আধুনিক বিমূর্তরীতির শিল্পী নন, তার প্রমাণ পাওয়া যাবে ঐ বর্ণনার শেষ ছত্রে:

যেন একটা মড়ার মাথার প্রকাণ্ড ওষ্ঠহীন হাসি, যেন দয়াহীন তপ্ত আকাশের কাছে বিপুল একটা শুষ্ক জিহ্বা মস্ত একটা তৃষ্ণার দরখাস্ত মেলিয়া ধরিয়াছে।

এই শিল্পীর সঙ্গে আধুনিক বিমূর্তরীতির শিল্পীর তফাৎ কী? দুজনেরই অরূপের সাধনা, কিন্তু প্রথমজনের কাজ বিমূর্তকে পরিচিত প্রতিমায় প্রতিষ্ঠা করা, কিন্তু দ্বিতীয়জন সরাসরি অরূপের রূপকে ধ্যান করেন। 'যেন', 'যেমন'-এর মধ্যস্থতা বর্জন করে, যা অরূপের বিমূর্ত রতন তাকেই রূপসাগরে ডুব দিয়ে তুলতে চান। অর্থাৎ তিনি রূপে অরূপকে বাঁধেন না, অরূপের রূপকে বাঁধতে চান।

abstract কথাটি তাই দার্শনিক। এবং নঙর্থক হলেও 'অরূপ' বা 'বিমূর্ত' শৈল্পিক। কারণ, 'অরূপ'-এর মধ্যে রূপের অস্তিত্ব আছে, বিমূর্ত ইঙ্গিত দেয় নির্বিশেষের বিশিষ্ট মূর্তির। কিন্তু abstract-এ অরূপের মিস্টিক ব্যঞ্জনা নেই, আবার আধুনিক বিমূর্ত চিত্রকলার জন্মসূত্র থেকে এই শব্দটি এই শিল্পরীতির প্রক্রিয়া ও পরিণতির ইঙ্গিত বহন করছে। শব্দটির দার্শনিক ও প্রক্রিয়াগত তাৎপর্য আমরা পরে বোঝার চেষ্টা করব।

abstract কথাটিতে কোনো অরূপের ব্যঞ্জনা না থাকলেও বিমূর্ত চিত্রকলা যে-অরূপের সাধনা তাতে কি কোনো অতীন্দ্রিয় অস্তিত্বের রূপসন্ধান আছে? মূর্ত বা প্রতিমাধর্মী চিত্রকলার বিরোধিতা করেছেন প্লেটো পরে খ্রিস্টধর্ম এবং ইসলাম। সংগীতের বিশুদ্ধতার তুলনায় চিত্রকলা ও কাব্য যে নিকৃষ্ট এই ধারণার জনক ও সমর্থক প্লেটো, প্লটিনাস, সেন্ট অগাস্টিন এবং তাঁদের মধ্যযুগীয় উত্তরসূরীরা। সংগীতের কদর প্লেটোর কাছে কেন বেশি ছিল তা রিপাবলিকের পাঠকরা সহজেই অনুমান করতে পারবেন। খ্রিস্টধর্ম ও ইসলামের চিত্রকলা সম্পর্কে আপত্তির কারণ ছিল একই— পৌত্তলিকতায় ঐ দুটি ধর্মের অরুচি। লাতিন-আমেরিকান লেখক লুই বর্গহেসের একটি গল্পে একজন সমালোচক বিমূর্ত চিত্রকলার সপক্ষে যা বলছেন তার সারার্থ হল:

বাইবেল ও ইসলামের নিষেধ ছিল দৃশ্যজগতের অনুকরণ করে ছবি আঁকার। সংগীত যেমন সৃষ্টি করে সুরের ও শব্দের নিজস্ব জগত, চিত্রকলারও প্রয়াস হওয়া উচিত অবয়ব ও রঙের এক স্বতন্ত্র জগত সৃষ্টি করা। সুতরাং আধুনিক বিমূর্তবাদী

শিল্পীরা চিত্রকলার মূলে ঐতিহ্যে ফিরে যাচ্ছেন, যে-ঐতিহ্যকে বিপথগামী করেছেন ড্যুয়েরার এবং রেমব্রান্টের মত হেরেটিক্‌স্‌রা।

এতে প্রচ্ছন্ন কৌতুক আছে নিঃসন্দেহে। কিন্তু মনে রাখা দরকার ৩১১ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট কনস্তান্তিনের চার্চ প্রতিষ্ঠার পর প্রায় তিনশ বছর বিতর্ক চলেছিল ব্যাসিলিকার ভিতরের দেয়ালে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি চিত্রিত হবে কিনা সেই প্রশ্নে। ষষ্ঠ শতকের শেষে চূড়ান্ত রায় দেন পোপ গ্রেগরি দ্য গ্রেট এই বলে যে, স্বাক্ষর ব্যক্তির কাছে পুঁথির যে প্রয়োজন সেই প্রয়োজনই নিরক্ষরের কাছে সমূর্ত চিত্রকলার। কিন্তু মানুষ ও দৃশ্য-জগতের প্রতিচ্ছবি না থাকলে চিত্রকলা কী চেহারা নিত তা আমরা জানি। কান্দিন্‌স্কি এই বিপদ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। বর্গহেসের গল্পে বিমূর্ত শিল্পীকুলের বিরোধীরা সেই কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন এই অভিযোগ করে যে, 'They are being influenced merely by broadloom rugs, kaleidoscopes and men's neckwear.' মাত্র একদশক আগে পশ্চিমে বিমূর্ত চিত্রকলার সরকারি ও বেসরকারি চাহিদা সম্পর্কে যে মন্তব্য শোনা গেছে তাতে মনে হয় না কোনো মিস্টিক প্রেরণায় বিমূর্ত ছবি আঁকা হচ্ছে বা দর্শকও কোনো আধ্যাত্মিক তৃষ্ণা নিয়ে বিমূর্ত ছবি দেখতে আসেন। একটু ক্ষোভের সুরেই একজন সমালোচক বলেছেন: '...abstraction is now regarded essentially non-controversial. Certainly it is non-erotic, non-political and non-sectarian.

কিন্তু চিত্রকলায় বিমূর্তের ধারণা মিস্টিসিজম না হলেও অধিবিদ্যা থেকে একেবারে বিমুক্ত ছিল না। অনেকের ধারণা, বহু শতাব্দী ধরে মানুষ জ্ঞানার্জনে, চেতনায় শিল্প-সৃষ্টিতে যে বিমূর্তনার অভ্যাস অর্জন করেছে তার মূলে আছে প্লেটো প্রমুখ দার্শনিক-দের অধিবিদ্যা। এমনকি খুব যত্নবান বাস্তবধর্মী ছবির শিল্পীরাও যখন গাছ বা স্টিল-লাইফে ফুল ফল বা অন্য কিছু এঁকেছেন বা প্রতিকৃতি ছাড়া মানুষের ছবি এঁকেছেন, তাঁরা কেউ-ই নির্দিষ্ট গাছ, ফুল ফল, বা মানুষের ছবি আঁকেননি। তাঁরা ঐ সব বস্তু বা প্রাণী সম্বন্ধে এক বিমূর্ত ধারণাকে ছবিতে রূপ দিয়েছেন। সেই রূপ অবশ্য প্রাথমিক। যা তাঁদের সৃষ্টিকে সার্থক করে তা ঐ প্রাথমিক বিমূর্ততা ছাড়াও আরও এক অনন্য বিমূর্ত শৈল্পিক গুণ। এই বিমূর্ত শৈল্পিক গুণ কী তা আমরা দেখব পরে বিমূর্ত চিত্রভাষা প্রসঙ্গে।

আধুনিক চিত্রকলায় বিমূর্তের নান্দনিক ধারণা এসেছে প্রাচীন ঐতিহ্যের সূত্রে সংগীত থেকে। ছবি যে সংগীতের সাধর্ম্য অর্জন করতে পারে তা গত শতকে শিল্পী কবি দার্শনিকেরা লক্ষ করেছিলেন— গ্যয়টে, শোপেনহাওয়ার, ব্যোদলেয়র এবং দেলাক্রোয়া। সংগীতের অভিব্যক্তি আত্মা ও চিত্তকে স্পর্শ করে এবং সংগীত প্রকাশও করে অন্তরাত্মার গভীর অনুভব ও অভিজ্ঞতা। বাহ্য জগতের কোনোরকম অনুষঙ্গ ছাড়াই। কান্দিন্‌স্কি তাই আর্টে আধ্যাত্মিকতার এবং অভিব্যক্তির কথা বলেছিলেন যাতে বিমূর্ত চিত্রকলা নিছক অলঙ্করণ হয়ে না দাঁড়ায়। কান্দিন্‌স্কির spiritual

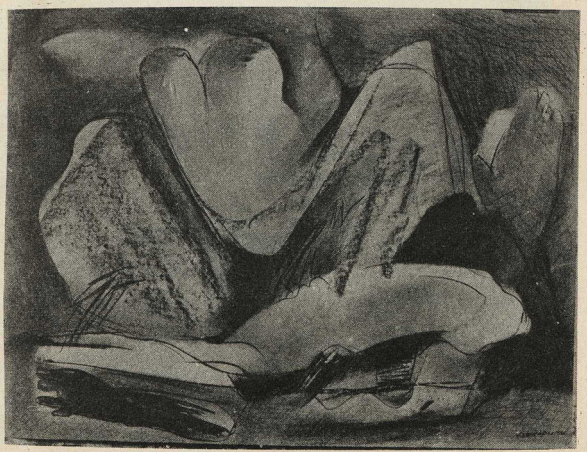

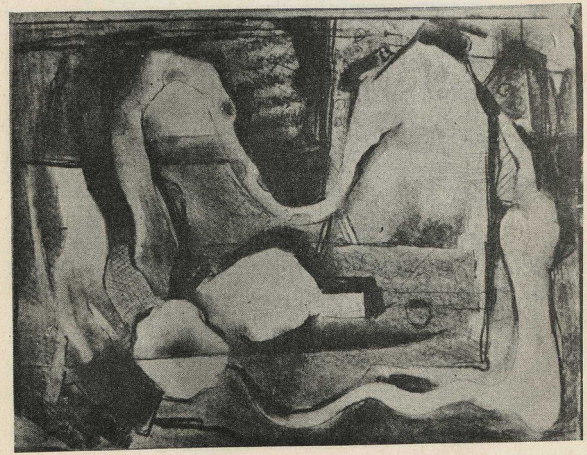

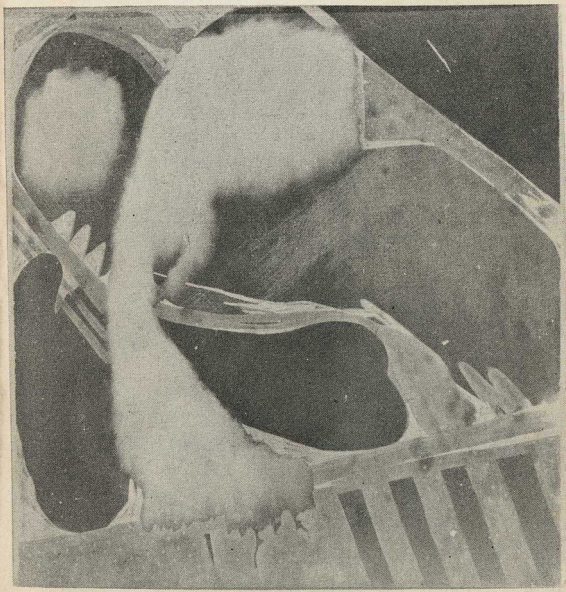

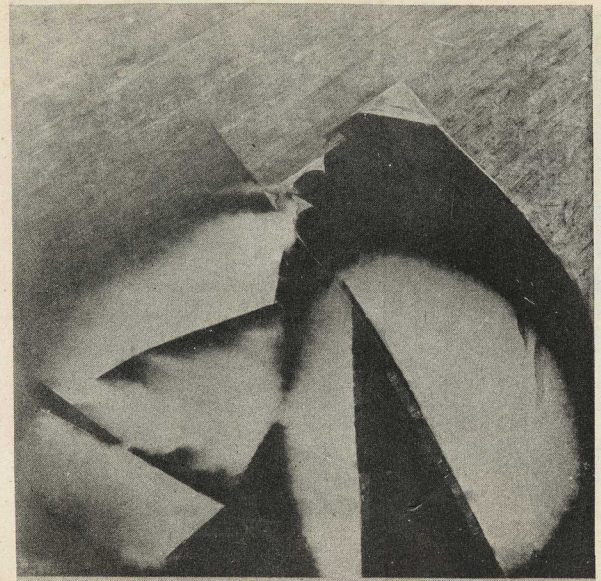

কথাটিকে বুঝতে হবে material-এর বিপ্রতীপ ধারণা হিসেবে। গ্যয়টে— যাঁকে কান্দিন্স্কি সাক্ষী মেনেছিলেন— বলেছেন, সংগীতের তুলনায় ছবির বস্তুভার অনেক। তার অর্থ, প্রথমত, মাধ্যমের বস্তুধর্মিতা ; দ্বিতীয়ত, বিষয়বস্তুর ভার এবং তৃতীয়ত, শিল্পকলার বিষয়ভার ছিল উনিশশতকী বস্তুবাদ (নাকি জড়বাদ) বা materialism-এর অনুষঙ্গী। চিত্রকলায় সেই জড়বাদের কলুষতাহীন এক আত্মিক জীবনবোধের অভিব্যক্তির প্রয়োজন ছিল। তাই চিত্রকলায় spiritualism ছিল জড়বাদের বিরোধিতা। এই সাংগীতিক সূত্রেই এসেছে বিমূর্ত চিত্রকলার একটি প্রধান প্রেরণা— চিত্রকলার বিশুদ্ধিকরণ। সংগীতের মতোই শিল্পকলাকে নামাতে হবে বিষয়ের ভার—তার কাঁধ থেকে। যেমন যা-কিছু কবিতা নয় তাকে বর্জন করে গত শতকের শেষপাদের ফরাসী কবিতা শুচিস্নাত হল, তেমনি ছবিকে বর্জন করতে হল image বা প্রতিমাকে। দৃশ্যজগতের অনুকৃতি সযত্নে পরিহার করাই হল বিশুদ্ধ (বা বিমূর্ত) চিত্রকলার লক্ষ্য। কারণ সব ধরনের প্রতিমাধর্মিতাকে মনে করা হল অ-শিল্প। মালার্মে, যিনি বলেছিলেন কবিতা শব্দ দিয়ে লেখা হয়, আইডিয়া দিয়ে নয়, তিনিই বললেন, **'Paint not the thing but the effect it produces'.**

অনেকে মনে করেন কান্দিন্স্কি নয়, পিকাসোই বিমূর্ত চিত্রকলার জনক। কিউবিজমই ঐ বিশুদ্ধিকরণের প্রথম ধাপ। পিকাসো এবং আরও অনেকে লক্ষ্যে পৌঁছনোর পথে, ছবিতে অবয়ব, ত্রিমাত্রিক জমি, পরিপ্রেক্ষিত ইত্যাদিতে এতদিনের অভ্যস্ত structure ভেঙে দৃশ্যজগতের নবনির্মিতি রচনা করতে গিয়ে দৃশ্যজগতকে এমনভাবে কেটে ছেঁটে বাদ দিয়েছিলেন, মনুষ্যমূর্তি'র এমন বিকৃতি ঘটিয়েছিলেন, বা প্রতিমাকে বিলীন করেছিলেন যে অনেক সময় বিমূর্ত ছবির সঙ্গে তাঁর ছবির ভাবগত না হোক দৃশ্যত কোনো অমিল ছিল না। শুধু এই যে, মনুষ্য অবয়ব বা দৃশ্যজগতের যে চিহ্নলেশ তাঁর কিউবিস্ট ছবিতে ছিল তা পিকাসো কোনোদিনই নিশ্চিহ্ন করেননি। এই সাদৃশ্যটুকু ছিল বলেই কাফকা তাঁর নিজের অন্তর্দৃষ্টিতে দেখা সমকালীন বাস্তবতার প্রতিচ্ছায়া দেখতে পেয়েছিলেন পিকাসোর ছবিতে। প্রাগে প্রথম কিউবিস্ট প্রদর্শনীতে কাফকার বন্ধু গুস্তাভ জানুশ পিকাসোর ছবি দেখে বলেছিলেন : 'খেয়াল-খুশি বিকৃতি।' উত্তরে কাফকার মন্তব্য ছিল :

> আমার তা মনে হয় না। পিকাসো সেইসব বিকৃতিই লক্ষ করেছেন যা আমাদের চেতনায় এখনও ধরা দেয়নি। শিল্পকলা আয়নার মতো। ঘড়ির মতো কখনো কখনো, সময়ের আগে আগে চলে।

পিকাসোর কিউবিস্ট ছবিতে কাফকা যে তাঁর বোধ-অনুভবের বিশ্বস্ততা দেখতে পেলেন, তাতেই প্রমাণ পাওয়া গেল কিউবিজমের বিমূর্ত চরিত্রের। কারণ, কিউবিজম মূলত আঙ্গিকধর্মী, চিত্রকলার এক নতুন প্রকরণ ও নান্দনিক মূল্যবোধ সৃষ্টি করাই ছিল কিউবিজমের লক্ষ্য। কিউবিজম আবিষ্কারের আগে পিকাসো ব্যক্তিগত আবেগ, সমাজভাবনা, কাব্য-সাহিত্যের প্রভাবে ছবি এঁকেছেন। কিন্তু কিউবিজমের ক্রমবিকাশ

ঘটেছে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে, বাইরের সবরকম প্রভাব সযত্নে এড়িয়ে। তাই কাফকা যখন পিকাসোর ছবিতে কোনো ভবিষ্য ঘটনার ছায়া দেখতে পেলেন তখন বিমূর্ত ছবির দর্শকদের মতোই তিনি নিয়ে এলেন 'something of their own to the work and to read into it whatever they want to discover.' মার্ক রোথকোর বিমূর্ত ছবিতে যেমন অনেকে এক গভীর আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনা দেখতে পান। কিউবিজমের রকমফের ছিল যাঁদের কাজে—ডেলনি, কুপকা, লেজের, দ্যুশাঁ, পিকারিয়া— তাঁরা বিমূর্ত চিত্রকলারীতির ক্রমবিবর্তনকে ঋদ্ধ পরিণতিতে নিয়ে গিয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় abstract কথাটিতে প্রক্রিয়া ও পরিণতির দ্বৈত ব্যঞ্জনা। বিচ্ছিন্ন করা, সারাংশ বা নির্যাস বার করা 'abstract' ক্রিয়াপদের অর্থ। ভাস্কর যেমন পাথর থেকে অপ্রয়োজনীয় অংশ ছেনে ছেনে মূর্তিটিকে বার করে আনেন, তেমনি দৃশ্যবস্তুর সব সাদৃশ্য বিলীন করতে করতে, প্রাকৃতিক অবয়বকে সরলীকৃত করে বা তার চিহ্নমাত্র আভাস রেখে অনেক শিল্পীই পৌঁছে গেছেন বিমূর্ত চিত্ররীতিতে। অনেকগুলি ক্যানভাসে বিমূর্ত একটি গাছের ডালপালা ছাঁটতে ছাঁটতে, facet cubism-এর পথ ধরে— এক অতি পরিশীলিত, অনার্দ্র, বুদ্ধি-নিয়ন্ত্রিত আবেগহীন চিত্রকলার সৃষ্টি করেছিলেন ডাচ শিল্পী মন্দ্রিয়ান। তাঁর বিশুদ্ধিকরণ ছিল কেবল চিত্রকলার নয়, বিমূর্ত চিত্রকলারও। মন্দ্রিয়ান ছাড়াও টাটলিন, ম্যালেভিচ, ড্যান ডোয়েসবার্গ গাবো, পেভ্‌স্‌নার এবং পরবর্তীকালের পোস্ট-পেইন্টারলি বিমূর্তবাদীদের ছবিতে এক ভিন্ন বিমূর্ত নন্দনভাবনা দেখা যাবে। তাঁরা কান্দিন্‌স্কির অন্তর্মুখীনতা বা বিমূর্ত অভিব্যক্তিবাদকে বর্জন করে বিমূর্ত চিত্রকলাকে অতিবিশুদ্ধ করেছিলেন এবং তার ফলে বিমূর্ত চিত্রকলায় যেটুকু spiritual বা আধ্যাত্মিক বোধের বীজ ছিল বলে অনেকের ধারণা তা অঙ্কুরিত হয়নি। আবার একথাও বলা চলে, কান্দিন্‌স্কির অভিব্যক্তিবাদী বিমূর্ত চিত্রকলার ক্রমান্বয়ী পরিশীলন ঘটেছে পরবর্তীকালের ডি কুনিং, নিউম্যান, জ্যাকসন পোলক, রোথকো, স্যাম ফ্রান্সিস, ক্লাইন প্রমুখ শিল্পীদের কাজে। এই উভয়বিধ বিমূর্তরীতির চিত্রকলায় জড়বাদ বা materialism-এর বিপ্রতীপ এক ব্যঞ্জনা আছে যা কঠিন মনন বা গভীর আবেগ থেকে উৎসারিত।

এর কারণ আধুনিক চিত্রকলায় বিমূর্তির প্রবণতার মূলে ছিল আধিবিদ্যা, আধ্যাত্মিকতা বা মিস্টিসিজমের নির্ভরতা ছাড়াই মানবমনের ভিতরের সত্য এবং বাইরের বস্তুজগতের সত্য সম্পর্কে অনেক বিমূর্ত ধারণা। বিজ্ঞান ও যন্ত্রসভ্যতার ক্রমপ্রসারের যুগে এই বিমূর্ত ধারণাগুলি জ্ঞান ও চেতনার অভাবনীয় বিকাশে অনন্য ভূমিকা নিয়েছে। জীববিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান যখন মানুষকে অনেক রহস্য, অনেক অতীন্দ্রিয় ধারণার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা দিয়েছে, তখন শিল্পীরা এক নতুন রহস্যবোধে উদ্দীপ্ত হয়েছেন। রূপাতীত অথচ বুদ্ধিগ্রাহ্য এক নতুন বাস্তবতার সন্ধান দিয়েছে আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান ও গণিত। সেই বিমূর্ত ধারণার মৌল অবলম্বন ছিল time, space, speed ও energy. অনন্ত মহাকাশ, অনন্তকাল, অবচেতনের অনন্ত রহস্য, অণুতে

নিহিত অনন্ত শক্তি এবং যন্ত্রের শক্তি, শক্তি থেকে অর্জিত গতি ইত্যাদির প্রবল অভিঘাত থেকে শিল্পীরা পেয়ে গেছেন জগত ও জীবন-সত্য সম্পর্কে নানা বিমূর্ত ধারণা। তাঁদের মিস্টিক হতে হয়নি।

এমনকি অন্তঃসত্য এবং বহিঃসত্য— বা reality within এবং reality without— এই দুইয়ের অদৃষ্টপূর্ব চেহারা যা এতদিন হিমশৈলের নিমজ্জিত অংশের মতো দৃষ্টি বা বোধের বাইরে ছিল, তার পরিধি, গভীরতা এবং শক্তির পরিচয় পেয়ে বিষয়ী (subject) ও বিষয়ের (object) মধ্যেকার এতদিনের অভ্যস্ত, পরিচিত সম্পর্কের ভারসাম্য অক্ষুণ্ণ রইল না। এরই প্রতিক্রিয়া আমরা দেখি ফোবিজম, কিউবিজম, সুররিয়ালিজম, ডাডাইজম, এক্সপ্রেশনিজম প্রমুখ বিশশতকী চিত্রকলার বিভিন্ন আন্দোলনে এবং অবশ্যই আমাদের আলোচ্য বিমূর্ত চিত্রকলায়। এই শতকের কলাচর্চার বিচিত্র এবং বহুধা বিবর্তনে প্রত্যক্ষ জগতবাস্তবতার অবমূল্যায়ন ঘটেছে এবং বিষয়ীর প্রতাপ বিষয়কে খর্ব করেছে যেসব রীতির চিত্রকলায় তার মধ্যে বিমূর্ত রীতির ছবি অন্যতম চরম দৃষ্টান্ত এবং অরূপের রূপের সন্ধানে সবচেয়ে অগ্রণী।

বিমূর্ত চিত্রকলার আলোচনায় বিমূর্ত চিত্রভাষার অনুল্লেখ মার্জনার যোগ্য ত্রুটি নয়। ছবির প্রসঙ্গে ছবির ভাষার কথা এসে যায় অনিবার্যভাবে। অর্থবহ যা-কিছু মানুষের সৃষ্টি তা যে এক ধরনের ভাষায় কথা বলে এবং সে-ভাষা মানুষের কথ্য ভাষার আদর্শে বিচার্য— এই ধারণা ইদানীং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। অধুনা প্রয়াত একজন প্রখ্যাত লেখক খুব খেদ করে বলেছিলেন, স্পষ্টতই আধুনিক চিত্রকলা সম্পর্কে, 'ছবি বুঝি না, কারণ, ব্যাকরণ জানি না।' এই খেদোক্তিতে হয়তো প্রচ্ছন্ন অভিযোগও ছিল যে চিত্রভাষার কোনো ব্যাকরণ নেই। কিন্তু এই খেদ বা অভিযোগের জন্যে ব্যাকরণ কোনোভাবেই দায়ী নয়, তার অস্তিত্বও জরুরি নয়। সব শিক্ষিত বাঙালিই বাংলা ভাষার ব্যাকরণ জানেন, কিন্তু বাংলা কবিতার পাঠকসংখ্যা অতি নগণ্য। সুতরাং ব্যাকরণের জ্ঞান থেকে নয়, কবিতাপাঠের অনুরাগী অভ্যাস থেকেই কবিতার ভাষা বোঝা যায়। তেমনি ছবির ভাষার সঙ্গে পরিচয় হয়, সে-ভাষা আয়ত্তে আসে, ছবি দেখার সনিষ্ঠ অভ্যাস থেকে। কেন প্রাথমিক ভাষার ব্যাকরণ জানলেই কবিতার ভাষা বোঝা যায় না সেই প্রসঙ্গে আমরা পরে আসব। কিন্তু তার আগে এই প্রবন্ধের অন্যত্র যে বিমূর্ত শৈল্পিক গুণের উল্লেখ করেছিলাম সেই কথা মনে রেখে ছবির ভাষা সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় আলোচনাটা সেরে নেওয়া যাক।

মূর্ত (representational) চিত্রকলায় শিল্পী কোনো সুস্পষ্ট বিষয়ের অবতারণা করেন এবং দৃশ্য বা প্রত্যক্ষ জগতবাস্তবতার সাদৃশ্যকে সেই বিষয়ের মুখ্য অবলম্বন করেন। মানুষজনের চেহারা, তাদের পরিবেশ (setting), পরিবেশে দু-একটি তাৎপর্যপূর্ণ বস্তুর উল্লেখ, আলোছায়া ইত্যাদি যে-সব অনুকৃতির উপাদান ছবিতে থাকে তাকে বলা হয় ছবির semantic বা অর্থবহ, সাদৃশ্যধর্মী অংশ। কিন্তু এই সেমান্টিক উপাদানের সংজ্ঞা দেয়, নিয়ন্ত্রিত করে রঙ, রেখা, জমি, অবয়ব, চিত্রবস্তুর

বিন্যাস ইত্যাদি plastic উপাদান। মূর্ত চিত্রভাষায় এই সাদৃশ্যধর্মী বা সেমান্টিক অংশটুকু দর্শককে প্রাথমিকভাবে জানিয়ে দেয় ছবির বিষয় কী। কিন্তু ছবির তাৎপর্যের পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণে ঐ প্লাসটিক অংশের আলোচনা অপরিহার্য। মনে রাখা দরকার যে কোনো ছবির ব্যঞ্জনা বা অভিব্যক্তি থাকে নিছক চিত্রবস্তুর সাদৃশ্যধর্মিতায় নয়, বরং দৃশ্য-বাস্তবতার সঙ্গে চিত্রবস্তুর ভিন্নতা বা বৈসাদৃশ্যে, যা বাস্তবধর্মী ছবির মতো সূক্ষ্ম, বা এক্সপ্রেশনিস্ট ছবি বা কিউবিস্ট ছবির মতো সোচ্চার হতে পারে। জিওকোন্ডার হাসি কি বাস্তবে সম্ভব? সম্ভব হলে দ্য ভিঞ্চির মোনালিসা নিয়ে আদৌ কি কোনো হইচই হত?

আবার আরও এক ধরনের ভিন্নতায় ঐ অর্থব্যঞ্জনা সমৃদ্ধ হয় যা এক শিল্পীর ছবি থেকে অন্য শিল্পীর ছবির পার্থক্য চিহ্নিত করে, বিষয় বা রীতি এক হলেও। লন্ডনের ন্যাশনাল গ্যালারিতে মনতেনিয়া এবং তাঁর শ্যালক বেলিনির আঁকা দুটি ছবি দেখতে পাওয়া যাবে। দুটিরই বিষয় ও নাম অভিন্ন—অ্যাগনি ইন দ্য গার্ডেন। দুটি ছবিই ইতালীয় হাই রেনেশানসের আগের কোয়াট্রোচেন্তো রীতিতে আঁকা হলেও মনতেনিয়ার ছবিতে আছে ভাস্কর্যসুলভ কাঠিন্য এবং অনার্দ্র দার্শনিক জিজ্ঞাসা কিন্তু বেলিনির ছবিতে পাওয়া যাবে আধ্যাত্মিক আবেগে আপ্লুত লিরিক সুষমা। এই শতাব্দীর সূচনায় বিভিন্ন জার্মান এক্সপ্রেশনিস্টদের বা আমাদের নব্যবঙ্গীয় ঘরানার অবনীন্দ্রনাথ, তস্য শিষ্য নন্দলাল, তস্য শিষ্য বিনোদবিহারীর ছবি দেখলে বোঝা যাবে রীতির অভিন্নতা সত্ত্বেও শৈলীর ভিন্নতা প্রত্যেক শিল্পীর চিত্রভাষায় বিশিষ্টতাকে সমৃদ্ধ করেছে।

শিল্পকলার নন্দনভাবনায় এই উভয়বিধ ভিন্নতার গুরুত্ব বেশি এবং ছবি যে শৈল্পিক-গুণে এই ভিন্নতা অর্জন করে তা মূলত বিমূর্ত। অলডাসহা ক্সলি যিনি বিমূর্ত চিত্রকলার অনুরাগী ছিলেন না এবং ছবির আলোচনায় বিষয়কে উপেক্ষা করে কেবল রচনা, আঙ্গিক ইত্যাদি নিয়ে অবয়বী (formal) বিশ্লেষণে যাঁর প্রবল অরুচি ছিল তিনিও স্বীকার করেছেন :

> ...Many works even of the Renaissance and the Baroque incorporate passages of almost unadulterated abstraction. These are often expressive in the highest degree. Indeed the whole tone of a representational work can be established, and its inner meaning expressed by those parts of it which are mostly nearly abstract.

বিমূর্ত বা প্রায়-বিমূর্ত অংশের জন্যেই, হাক্সলির মতে, কজিমো তুরা এবং পিয়েরো দেল্লা ফ্রানচেসকার ছবির মেজাজে এত গভীর পার্থক্য।

সুতরাং ছবি যখন সর্বৈব বিমূর্ত তখন তার ভাষাগত প্রকরণ ও প্রক্রিয়ার একটা স্বাতন্ত্র্য বোধহয় সহজেই অনুমান করা চলে এবং অবিমূর্ত ছবির ভাষার সঙ্গে বিমূর্ত ছবির ভাষার সম্পর্ক নিছক শরিকী নয়। নিজের বর্ণমালা, ব্যাকরণ এবং দুরূহ পাঠ নিয়ে সে-ভাষা স্বরাট।

চিত্রকলায় আধুনিকতার সূচনা ও ক্রমবিকাশের সমকালেই মানুষের ভাষার চরিত্র, গঠন, প্রক্রিয়া ও প্রকরণ ইত্যাদি নিয়ে ফার্দিনান্দ দ্য সস্যুর, লেভি স্ট্রাউস, রোমান জ্যাকবসন প্রমুখ পশ্চিমী পণ্ডিতেরা গভীর অনুসন্ধান ও তাত্ত্বিক আলোচনা করেছেন। আধুনিক এই স্ট্রাকচারালিস্ট ভাষাতত্ত্বের সূত্র ধরেই সমাজ, সংস্কৃতি, সাহিত্য-শিল্প এমনকি ফ্যাশন, ইত্যাদি অনুধাবন করার নতুন নতুন তাত্ত্বিক প্রয়াস চলছে গত কয়েক দশক ধরে। সস্যুরের প্রদর্শিত পথে স্ট্রাকচারালিস্ট ও ফর্মালিস্টরা সাহিত্য সমালোচনায় নানা জটিল তত্ত্বের উদ্ভাবন করেছেন। তাঁদের তত্ত্বের ক্রমবিবর্তনে আবার পোস্ট-স্ট্রাকচারালিস্টরা তাত্ত্বিক জটিলতায় আরও অনেকদূর এগিয়ে গেছেন। জটিলতা যাই থাকুক বিমূর্ত চিত্রভাষার আলোচনায় স্ট্রাকচারালিস্ট ও ফর্মালিস্টদের তত্ত্ব উপেক্ষা করা চলে না। বিচার্য বিষয় অবশ্য এই যে, আধুনিক ভাষাতত্ত্ব এবং ভাষাতত্ত্ব-প্রসূত সমালোচনা তত্ত্বের আলোয় বিমূর্ত চিত্রভাষার বিশ্লেষণ বা চরিত্ররূপ নির্ধারণ করা যায় কিনা।

প্রথমেই স্ট্রাকচারালিস্ট ভাষাতত্ত্বের প্রসঙ্গ না এনে আমরা ফর্মালিস্টদের তত্ত্বের সাহায্যে বিমূর্ত চিত্রভাষা বোঝার চেষ্টা করতে পারি। কারণ, বিমূর্ত চিত্রকলার নন্দনভাবনার সঙ্গে ফর্মালিস্টদের কাব্যতত্ত্বের একটা নিকট সম্পর্ক আছে। আধুনিক চিত্রকলার বিষয়মুক্তি যেমন সম্পূর্ণ হয়েছে বিমূর্ত চিত্রকলায় তেমনি ফর্মালিস্টদের তাত্ত্বিক আলোচনা কেবল ফর্মকে নিয়ে। তাঁদের ধারণায় কাব্যে বিষয়বস্তু নয়, ফর্ম বা রূপই হল কাব্যের সর্বাকছু এবং নানাভাবে ভাষার রূপান্তর ঘটিয়ে সম্ভব হয় কাব্যের রূপ-নির্মিতি। কাব্যভাষার এই রূপান্তরের রহস্য না জানলে নিছক ব্যাকরণ জানলেই কবিতা বোঝা যায় না। আর মাতৃভাষা যেমন ব্যাকরণ না জেনেই আয়ত্তে আসে কেবল প্রত্যক্ষ পরিচয় থেকে, কাব্য-শিল্পের ভাষাও তেমন করে আমরা শিখে যাই।

কিন্তু কাব্যের রূপান্তরিত ভাষা মাতৃভাষা নয়। ফর্মালিস্টদের গুরু জ্যাকবসন এই ভাষার নাম দিয়েছেন metalanguage বা রূপান্বিত ভাষা। এই ভাষার প্রধান দুটি কাজের একটি হল উল্লেখধর্মী (referential) এবং অপরটি হল কাব্যিক বা সৃষ্টিধর্মী (creative)। লেভি স্ট্রাউসও ভাষার এই দুটি চরিত্রকে চিহ্নিত করেছেন যথাক্রমে message ও myth অভিধা দিয়ে। message কথাটিও জ্যাকবসনের। বিমূর্ত চিত্রভাষাকেও এমনই এক metalanguage বলা চলে। অরূপের রূপ, আগেই বলেছি, অনির্বচনীয় এবং সেই রূপকে ব্যঞ্জিত করার জন্যে যে বিশিষ্ট ভাষার প্রয়োজন বিমূর্ত চিত্রভাষা তেমনই এক রূপান্বিত ভাষা। কবিরা যে রূপময় শব্দপ্রতিমা সৃষ্টি করেন তার অর্থগৌরব থাকুক বা না থাকুক তার আসল শক্তি তার কাব্যময়তায়। রঙ, রেখা, অবয়ব ও জমির বিন্যাসে বিমূর্ত চিত্রকলায় যে দৃষ্টিবাহিত প্রতিমার সৃষ্টি হয় তার কোনো অর্থ থাকে না, থাকে কেবল নয়নবেদ্য এক কাব্যময় ব্যঞ্জনা। বিমূর্ত চিত্রে যেমন, কবিতাতেও তেমনি, সেই ব্যঞ্জনার অভিঘাত ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে ভিন্ন হতে পারে, অর্থও চিরকাল অপরিবর্তনীয় থাকে না। কবিতায় কোনো নির্দিষ্ট অর্থ

থাকলেও বিমূর্ত চিত্রকলায় থাকে না, কিন্তু কবিতার সেই অর্থকে গৌণ করে দেয় ভাষার রূপময়তা। জ্যাকবসন দৃষ্টান্ত দিয়েছেন: I like Ike— নির্বাচনে আইসেন-হাওয়ারকে সমর্থনের পক্ষে একটি স্লোগান। এতে অবশ্যই, এক অনড় অর্থবস্তু আছে। এবং তা অন্যভাবে বলা যায় আরও বিশদ করে। কিন্তু অতি সংক্ষিপ্ত ঐ উক্তিতে ধ্বনি-সুষমামণ্ডিত মাত্র তিনটি শব্দে অর্থের অতিরিক্ত যে অভিব্যক্তি আছে তা আর কোনো সহজ-উচ্চার্য বাক্যে পাওয়া যাবে না। জ্যাকবসনের দৃষ্টান্ত অতি নিকৃষ্ট, মনে হয় যেন ফর্মালিস্ট তত্ত্ব-প্রতিষ্ঠার উপযোগী একটি দৃষ্টান্তকে তিনি উদ্দেশ্যমূলক-ভাবে তুলে এনেছেন। আমরা আমাদের হাজারো প্রিয় কবিতার উজ্জ্বল লাইন তুলে এনে দেখাতে পারি সে-সব দৃষ্টান্তের অর্থগৌরব কম নয় যেমন কীটসের একটি কবিতার সূচনা ছত্রটি— 'A thing of beauty is joy for ever.' কিন্তু অর্থের ঋদ্ধতা তুচ্ছ হয়ে যায় রূপান্বিত ভাষায় তাকে ধরা না গেলে। A beautiful object is a constant source of joy বললে একই অর্থ বজায় থাকত কিন্তু উবে যেত তার কাব্যগুণ যাকে ফর্মালিস্টরা নাম দিয়েছেন literariness।

জ্যাকবসনের metalanguage-এ সাধারণ বা অভ্যস্ত ভাষার যে রূপান্তর ঘটে এমন কিছু করে যাতে message-এর প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। message কথাটির অর্থ অবশ্যই ভাষায় নিবদ্ধ উক্তির রূপ, উক্তিতে বিধৃত বক্তব্য নয়। এবং উক্তির ভাষাগত রূপটিকে প্রত্যক্ষ করানোর কাজটিকে ফর্মালিস্টরা বলেন foregrounding বা সম্মুখীকরণ। এই সম্মুখীকরণ নানাভাবে করা যায় এমনকি বাক্যের ব্যাকরণশুদ্ধ অন্বয় ভেঙে বা অন্য শব্দের সঙ্গে আপাত সম্পর্কহীন একটি শব্দকে বাক্যের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিয়ে, যেমন: 'সান্ধ্য উমাকীর্তিবাবুর চরণাশ্রিত সঙ্গীত/গাই।' জ্যাকবসন অবশ্য অতিবিন্যস্ত (highly patterned) ভাষার ব্যবহারকেই সম্মুখী-করণের প্রধান প্রকরণ বলেছেন। বিমূর্ত চিত্রভাষায় এই সম্মুখীকরণ কীভাবে ঘটে বা আদৌ ঘটে কিনা তা দেখার আগে একটি জরুরি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া দরকার। জ্যাকবসনের metalanguage-এ অর্থ গৌণ হয়ে literariness মুখ্য হয়ে উঠলেও অর্থ থাকেই। কারণ মানুষের ভাষায় ব্যবহৃত শব্দের আভিধানিক অর্থ আছে। বিমূর্ত চিত্রভাষায় ব্যবহৃত উপাদানে এমন কোনো নির্দিষ্ট অর্থ নেই, যদিও কাল্পনিক চেষ্টা করেছিলেন এইরকম অর্থ চিহ্নিত করার। বরং মূর্ত চিত্রকলায় সেই অর্থ থাকে এবং ভাষারও রূপান্তর ঘটে। সুতরাং metalanguage কেবল বিমূর্ত চিত্রভাষার সম্পত্তি নয় বরং সামগ্রিকভাবে মূর্ত-বিমূর্ত সব চিত্রভাষাকেই আমরা রূপান্বিত ভাষা বলতে পারি।

বস্তুত চিত্রভাষার বিশুদ্ধ চরিত্রগত বা কাঠামোগত (synchronic) বিশ্লেষণে দেখা যাবে সব রীতির ছবির ভাষাই রূপান্তরিত হয় ফর্মালিস্টদের নির্দিষ্ট করা দুটি প্রক্রিয়ায়: সম্মুখীকরণ এবং অপরিচিতীকরণ (defamiliarisation)। কিন্তু আমরা যদি আধুনিক চিত্রকলার ভাষার ক্রমবিকাশ (diachrony) আলোচনা করি

তাহলে দেখব ঐ রূপান্তরণ প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত পরিণতি ঘটেছে এবং গুণগত পরিবর্তনে তা এক স্বাতন্ত্র্য অর্জন করেছে বিমূর্ত চিত্রকলায়। গত শতাব্দীর শেষ দু'তিনটি দশকে চিত্রকলায় আধুনিকতার সূচনা হয়েছে এবং সেই সংগে চিত্রভাষার প্লাস্টিক উপাদানের সম্মুখীকরণ এবং সেমান্টিক বস্তুর অপরিচিতীকরণ শুরু হয়েছে। প্রথম পথিকৃৎ ছিলেন ইম্প্রেশনিস্টরা। বহুদিনের অভ্যস্ত (ফর্মালিস্টদের ভাষায় automatized) বাস্তবতাবাদী বা স্বাভাবিকতাবাদী (naturalistic) ভাষাই যখন ছবির একমাত্র এবং প্রাথমিক ভাষা বলে সর্বজনস্বীকৃতি পেয়ে এসেছে এবং দর্শক যখন ঐ ভাষার স্বচ্ছ কাচের ভিতর দিয়ে দৃশ্যবাস্তবতার হুবহু অনুকরণ দেখতে দেখতে চিত্রভাষার ভূমিকার কথা বিস্মৃত হয়েছেন, তখন প্রয়োজন ছিল চিত্রভাষাকে রূপায়িত করার প্রক্রিয়া দুটির নবীকরণের। দৃশ্যজগতের হুবহু অনুকৃতি বর্জন করে, পরিচিত অবয়বের ভাঙচুর করে, বা অতিসরল করে, বাস্তবধর্মী ত্রিমাত্রিক জমির দ্বিমাত্রিক ব্যাখ্যা দিয়ে, স্বাভাবিক বর্ণ-ব্যবহার বিসর্জন দিয়ে, রেখার প্রয়োগ বাড়িয়ে দিয়ে, অমসৃণ বর্ণপ্রলেপে চিত্রপট ভরিয়ে দিয়ে এবং সর্বোপরি বিষয়ের ভার লাঘব করে সম্মুখীকরণ এবং অপরিচিতীকরণ প্রক্রিয়া অনুসৃত হয়েছে আধুনিক চিত্রকলার বিভিন্ন রীতি ও প্রকরণ আবিষ্কারে। বিমূর্ত চিত্রকলা যে পথ বেছেছে এই নবীকরণের তা হল ছবি থেকে দৃশ্যজগতের সার্বিক নির্বাসন। এই নির্বাসনের ফলে চিত্রভাষার নান্দনিক অভিঘাতে, প্রকরণ ইত্যাদিতে বিমূর্ত চিত্রকলা এক বৈপ্লবিক চরিত্র অর্জন করেছে। সেই জন্যেই বিমূর্ত চিত্রভাষার চরিত্রগত বিশ্লেষণে স্ট্রাকচারালিস্ট তত্ত্ব প্রয়োগের অবকাশ আছে। কিন্তু যে গভীর অন্বেষা এবং তত্ত্বের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রয়োগ-কৌশলে সেই বিশ্লেষণের বিস্তৃত পরিসর পরিক্রমা করা উচিত তা বর্তমান লেখকের আয়ত্তে নেই এবং এই প্রবন্ধের পরিধিতে সম্ভবও নয়। কিন্তু সমস্যাটির রূপরেখা আমরা অনুমান করতে পারি।

সস্যুর এবং লেভি স্ট্রাউসের মতে মানুষের ভাষা হল একটি সুসংগঠিত চিহ্নব্যবস্থা যা কোনো ব্যক্তির সৃষ্টি নয়, গোষ্ঠীর সৃষ্টি। চিহ্ন বা sign-এর দুটি উপাদান: চিহ্নকারী (signifier) এবং চিহ্নিত (signified) অর্থাৎ যথাক্রমে **শব্দ** এবং **শব্দ যে-অর্থ** বহন করে। চিহ্ন ব্যবস্থায় চিহ্ন ও চিহ্নিতের মধ্যে সম্পর্ক মূলত নির্বিচার (arbitrary) এবং প্রচলিত ও প্রথাসিদ্ধ সম্পর্কসমূহের বিচিত্র, জটিল কাঠামোর (structure) মধ্যেই চিহ্ন অর্থবহ হয়, চিহ্ন ব্যবস্থা কাজ করে। কথিত ভাষায় চিহ্নের দুটি বৈশিষ্ট্য— একটি ধ্বনিগত, অপরটি অর্থগত। অনুরূপভাবে, যেমন আগেই বলা হয়েছে, চিত্রভাষারও দুটি উপাদান— প্লাস্টিক বা রঙ রেখা, অবয়ব ইত্যাদি এবং সেমান্টিক— রঙে, রেখায়, অবয়বে চিহ্নিত বা রূপায়িত দৃশ্যবস্তুর সাদৃশ্য, উল্লেখ বা অনুকৃতি।

বিমূর্ত চিত্রভাষার সমস্যা এই যে আপাতদৃষ্টিতে চিহ্ন থাকলেও চিহ্নিত বলে কিছু নেই। অন্তত সেমান্টিক উপাদান না থাকাই বিমূর্ত চিত্রকলার প্রাথমিক শর্ত।

অর্থাৎ উপাদান বাদ দিয়ে যা থাকে—রঙ, রেখা ইত্যাদি—যাকে আমরা প্লাস্টিক উপাদান বলি তাকে কি আমরা sign বা অর্থযুক্ত চিহ্ন বলতে পারি? এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার আগে স্ট্রাকচারালিস্ট ভাষাতত্ত্বের আলোয় বিমূর্ত চিত্রভাষার মৌল সমস্যার দিকে দৃষ্টি দেওয়া দরকার। আমাদের উত্তর যদি ইতিবাচকও হয় (অর্থাৎ বিমূর্ত ছবির প্লাস্টিক উপাদানকে আমরা অর্থযুক্ত চিহ্নের মর্যাদা দিই), লেভি স্ট্রাউস লক্ষ করেছিলেন, বিমূর্ত চিত্রকলায় কোনো সুসংগঠিত চিহ্নব্যবস্থা নেই, থাকলেও তা কোনো ব্যক্তির সৃষ্টি, গোষ্ঠীর নয় এবং একই শিল্পীর প্রথম জীবন এবং পরবর্তীকালের শিল্পকর্মে একই চিহ্নব্যবস্থা সক্রিয় না থাকতেও পারে। তাছাড়া প্রত্যেক শিল্পীই সচেতন প্রয়াসে একটি নিজস্ব শৈলী গড়ে তোলেন কিন্তু বিমূর্ত চিত্রকলায় অর্থহীন চিহ্নের প্রাতিস্বিক প্রয়োগ এতদূর স্বতন্ত্র হতে পারে তা একটি সার্বিক ব্যবস্থা বা langue-এর অধীন parole বা বিশিষ্ট প্রয়োগ না হয়ে এক স্বতন্ত্র ব্যবস্থার জনক হতে পারে। কান্দিন্স্কির বিমূর্ত ভাষা, মন্দ্রিয়ান বা ডোয়েসবার্গের বিমূর্ত ভাষা থেকে একেবারে ভিন্ন চরিত্রের।

কিন্তু চিহ্নের যখন কোনো নির্দিষ্ট অর্থ থাকে না তাকে কি আমরা চিহ্ন বা sign বলতে পারি? মর্জিনা যখন আলিবাবার বাড়ির দরজার একটি খড়ির দাগ দেখেছিল তখন অবশ্যই তা অর্থবহ চিহ্ন ছিল। কিন্তু রাত্রে দস্যুরা যখন একই খড়ির দাগ সব বাড়ির দরজায় দেখতে পেল, তখন সে-দাগ তাদের কাছে নিছক দাগ হয়ে রইল, চিহ্ন হয়ে উঠল না, অর্থাৎ কোনো একটি নির্দিষ্ট বাড়িকে চিহ্নিত করতে পারল না। বিমূর্ত চিত্রভাষায় আমরা এমন অর্থযুক্ত চিহ্ন কি পেতে পারি, যে-অর্থে চল্লিশটি দস্যুর প্রত্যেকে চিনে নেবে কোন্‌টি আলিবাবার বাড়ি?

কিন্তু দস্যুদের মধ্যে যদি কোনো কলারসিক থাকত সে হয়তো চিনে ফেলতে পারত যে সবগুলির মধ্যে মাত্র একটি খড়ির দাগ কর্কশ, কঠোর পুরুষের হাতের, অন্যগুলি কোমল নারী-আঙুলে ধরা খড়ির টুকরোর দাগ। হয়তো তা সম্ভব ছিল না কারণ মর্জিনা খুব বুদ্ধিমতী নারী, দাগ দেওয়ার সময় সে নিশ্চয় প্রথম দাগটির হুবহু নকল করেছিল। (অন্তত তাকে তাই করতে হত যদি দস্যুদের মধ্যে তার চেয়ে বুদ্ধিতে দড় কোনো লোক থাকত। না হলে গল্পের পরিণতি অন্যরকম হত।) দাগগুলির মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে কিনা খুঁজতে গেলে, চিহ্নিত নয়, চিহ্নের প্রতি নজর দেওয়ার প্রয়োজন হত। বিমূর্ত চিত্রকলায় ঐ চিহ্ন বা প্লাস্টিক উপাদানের শরীরী রূপটিই একমাত্র দৃষ্টিগ্রাহ্য কনটেন্ট বা চিত্রবস্তু, কোনো অর্থ যদি তার খুঁজতেই হয় তবে তা তার মধ্যেই পাওয়া যাবে, তার বাইরে নয়। এবং তাকে কেবল অর্থ না বলে অভিব্যক্তি, ব্যঞ্জনা বলা চলে।

সরু মোটা বা চওড়া তুলি রঙে ডুবিয়ে সাদা ক্যানভাসের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত টানলে একটি ব্যঞ্জনার সৃষ্টি হয়। সে-ব্যঞ্জনার তারতম্য ঘটে সেই আঁচড় তুলির না হয়ে যদি প্যালেট নাইফের হয়, সরু বা মোটা হয়, ভারি বা হাল্কা হয়, খুব দৃঢ়

কম্পমান হাতে, দ্রুত বা অলস ভঙ্গিতে সেই দাগ টানা হয় বা শুরুতে সরলরেখার মতো, মাঝখানে উত্তাল তরঙ্গের মতো, শেষে নিস্তরঙ্গ রূপ নেয় সেই দাগ। অভিব্যক্তির খুব বড় রকম পার্থক্য ধরা দেয় যদি সেই রঙের প্রলেপ বা রেখা খুব সুপরিকল্পিত হয় বা তাৎক্ষণিক প্রেরণা বা উদ্দীপনার ক্ষিপ্র স্বাচ্ছন্দ্যে আছড়ে পড়ে পটের গায়ে। তুলির আঁচড় বা প্যালেট নাইফের দাগ, নানা রঙের ছোপ অর্থবহ হয়ে ওঠে তাদের নিজস্ব বস্তুসত্তার জোরে, নানাভাবে নিয়ন্ত্রিত এবং বিভাজিত চিত্রপটের জমিতে তাদের অবস্থান-বিন্যাসে এবং তাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কে। সেই সম্পর্ক তীব্রতা, নম্রতা, সংঘাত বা সুষমার বিচিত্র মাত্রা পায় চড়া, নম্র, হাল্কা, গাঢ় ইত্যাদি বর্ণচ্ছায়ের বৈচিত্র্যে, মসৃণ বা অমসৃণ বর্ণপ্রলেপে, বিভিন্ন অবয়বের আয়তনে, আকারের অনিশ্চয়তায় বা তার নিশ্চিত, তীক্ষ্ণ জ্যামিতিক চরিত্রে। এমনিভাবে বিমূর্ত ছবির ফ্রেমে সৃষ্টি হয় এক চিত্র-কাঠামো যাকে জ্যাকবসন বলেছেন, কবিতার verbal structure-এর প্রসঙ্গে, ছবির pictorial structure। এই চিত্র-কাঠামোর মধ্যেই চিত্রবস্তুর রূপ ব্যঞ্জনাময় হয়ে ওঠে।

সেই জন্যে বিমূর্ত ছবির চিত্রবস্তুকে আমরা অর্থবহ চিহ্নে বা চিহ্নসমূহে রচিত চিত্ররূপ বলতে পারি। কোনো সেমান্টিক কনটেন্ট থাকে না বলে বিমূর্ত ভাষা বিশেষ রূপময়তা অর্জন করে মূলত সম্মুখীকরণ প্রক্রিয়ায়। বলা যেতে পারে মূর্ত চিত্রকলাতে যে বিমূর্তে উপাদান—যার উল্লেখ করেছেন অলডাস হাক্সলি— এতদিন দৃষ্টির অলক্ষ্যে ছিল চিহ্নিতের প্রবল দাপটে, বিমূর্ত চিত্রকলা তাকেই সম্মুখীকরণ করেছে চিহ্নিতকে আপাত নিশ্চিহ্ন করে। সস্যুর বলেছেন ভাষা একটি কাগজের মতো যার সম্মুখ পৃষ্ঠায় থাকে চিহ্নিত চিন্তাবস্তু বা অর্থ, পিছনের পৃষ্ঠায় থাকে চিহ্নকারী ধ্বনি। একটিকে অপরটি থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। বিমূর্ত চিত্রভাষায় ঐ কাগজটিকে উল্টে ধরা হয়েছে অর্থাৎ চিহ্নকারী এখন সামনের পৃষ্ঠায়। তাই চিহ্নিত নয়, চিহ্নকারী এবং চিহ্নকরণের (siginification) আধিপত্য বিমূর্ত ছবির ক্যানভাসে। কিন্তু চিহ্নিতের অবস্থান কোথায়? যে অর্থ বা ব্যঞ্জনা ঐ চিহ্ন থেকে উৎসারিত হয় তা— পোস্ট স্ট্রাকচারালিস্টদের অনুসরণ করে বলা চলে— স্বতঃসিদ্ধভাবে চিহ্নেই সংলগ্ন থাকে না। যদি থাকত তাহলে চিহ্নকারীর গুরুত্ব কমে গিয়ে চিহ্নিতই প্রধান হয়ে উঠত। চিহ্নকারী কেবলমাত্র চিহ্নিতের অনুপস্থিতি উপস্থিতির নিছক পরিবর্ত হিসেবে কাজ করত। যেমন আমরা বাস্তবধর্মী ছবিতে প্লাসটিক উপাদানের উপস্থিতি ভুলে দিয়ে সেমান্টিক উপাদানকে ছবির সর্বস্ব মনে করি। বিমূর্ত চিত্রকলায় সে-সুযোগ নেই। চিহ্নিতের অনুপস্থিতি বা চিহ্নের নির্বিশেষ ব্যঞ্জনার জন্যে দর্শকের দৃষ্টি ধরে রাখে চিহ্নকারী। ক্যানভাসে প্রলিপ্ত রঙ, রঙের ছায়াপ্রচ্ছায়, বুনট, জমির বিভাজন, সাদৃশ্য বর্জিত অবয়বের বিচিত্র রূপ বিন্যাসে বিধৃত থাকে নির্বিশেষ অরূপের রূপ।

আমরা ইতিপূর্বে সস্যুর-আলোচিত langue এবং parole-এর উল্লেখ করেছি। নৈর্ব্যক্তিক নিয়মকানুনে নিয়ন্ত্রিত একটি সার্বিক চিহ্নব্যবস্থাকে সস্যুর বলেছেন

লাঙ্গে আর এই চিহ্নব্যবস্থার সক্রিয় অস্তিত্বের প্রমাণ মেলে প্যারোলে বা ভাষার নির্দিষ্ট প্রয়োগে— কথায় বা লেখায়। বিমূর্ত চিত্রভাষায় এই সুসংগঠিত লাঙ্গের অস্তিত্ব কিছুটা অনিশ্চিত। কয়েকটি মূল বৈশিষ্ট্য অবশ্যই আছে যা দিয়ে বিমূর্ত চিত্র ভাষার সাধারণ সংজ্ঞা নির্দেশ করা যায়, অন্য চিত্ররীতির ভাষা থেকে আলাদা করা যায় কিন্তু তা দিয়ে একটি লাঙ্গের ধারণা গড়ে তোলা যায় না। কারণ, আমরা আগেই বলেছি বিমূর্ত চিত্রভাষা কোনো গোষ্ঠীর নয়, ব্যক্তির বা কয়েকজন ব্যক্তির সৃষ্টি বলে কোনো সুসংগঠিত নৈর্ব্যক্তিক চিহ্নব্যবস্থা হতে পারে না।

আবার যখন কোনো শিল্পীর বিমূর্ত চিত্রকলা আলোচ্য বিষয় হয়— কান্দিন্স্কি, টাটলিন, বা জ্যাকসন পোলক— তখন আমরা মোটামুটি একটি লাঙ্গের ধারণা নিয়ে শুরু করলেও প্যারোলের বিশ্লেষণেই মনোযোগী হতে হয়। নির্দিষ্ট ছবিতে বা নির্দিষ্ট কোনো শিল্পীর কোনো পর্বের ছবিতে বিধৃত চিত্রকাঠামোর মধ্যেই চিহ্নবস্তুর অর্থ বা ব্যঞ্জনার সন্ধান সীমিত রাখতে হয়। যে বিমূর্ত ভাষায় কান্দিন্স্কি আধ্যাত্মিক আবেগ প্রকাশ করেন, সেই বর্ণমালা, শব্দসম্ভারে (vocabulary) রোঠকোর ছবির আধ্যাত্মিকতা ব্যঞ্জিত হয় না। এই প্যারোলের প্রাধান্য আমরা বুঝতে পারি আরও দুজন রুশ ফর্মালিস্টের কাব্যভাষার তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ থেকে। এঁরা দুজন হলেন ভোলোসিনভ এবং বাখতিন। এঁরা দুজনেই সস্যুরের মতো ভাষাকে নৈর্ব্যক্তিক, বিমূর্ত চিহ্নব্যবস্থা মনে করেন না যেখানে চিহ্নিত ও চিহ্নকারীর মধ্যে সম্পর্কের একটি অবিভাজ্য, অপরিবর্তনীয় কাঠামো থাকে। তাঁরা মনে করেন ভাষা নির্দিষ্ট সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে কথক ও শ্রোতা, লেখক ও পাঠকের মধ্যে সংলাপের মতো যাতে বিভিন্ন evaluative accents বা মূল্যসূচক জোর দেওয়ার জন্যে একটি নিশ্চল ব্যঞ্জনা বা নির্দিষ্ট অর্থের পরিবর্তে অর্থ একাধিক হতে পারে, ব্যঞ্জনা বহুমাত্রিকতা অর্জন করে। বিমূর্ত ছবিতেও চিত্রভাষা এইরকম dialogic বা সংলাপধর্মী। সংলাপ চলে ব্যক্তি শিল্পীর সঙ্গে ব্যক্তি দর্শকের। অর্থ ও ব্যঞ্জনা তাই দর্শকে দর্শকে ভিন্ন হয় এবং একই শিল্পীর ভিন্ন ভিন্ন ছবিতে চিহ্নকারী ভিন্ন ভিন্ন অর্থ বহন করতে পারে। বা চিহ্নের ভিন্নতা সত্ত্বেও চিহ্নিত একই হতে পারে।

তবু বিমূর্ত চিত্রকলার সামগ্রিক বয়ান বা discourse-এ এইরকম প্যারোলের লক্ষণাক্রান্ত স্বতন্ত্র দুটি কি তিনটি চিহ্নব্যবস্থা পেয়ে যেতে পারি— একটিতে চিহ্নের কাজ হল প্রবল আবেগমথিত অন্তঃসত্যকে রূপায়িত করা যেমন কান্দিন্স্কি, জ্যাকসন পোলক। আর অন্যটিতে চিহ্নিত হল সবরকম ব্যক্তিগত আবেগবর্জিত, বহিঃসত্যের দার্শনিক নির্মিতি যার দৃষ্টান্ত টাটলিন, রোডচেংকো, মন্দ্রিয়ান, ডোয়েসবার্গ। এমন নয় যে এই দুটি ঘরানাতে বিমূর্ত চিত্রকলার বহুধা বৈচিত্র্যকে ধরা যাবে। কিন্তু সেই বিস্তারিত আলোচনা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। □